ইউনিট ৪: মানব সম্পদ উন্নয়নে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা
Role of Formal Education in Human Resource Development

ভূমিকা

মানুষকে সম্পদে পরিণত করতে হলে মানুষের কর্মক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। আর এই উৎকর্ষতা বাড়ে তার কর্মদক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে। শিক্ষা হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যার মাধ্যমে মানুষ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করতে পারে। অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্বকে অপরিহার্য বলে স্বীকার করেছেন। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় মানব উন্নয়ন ধারণাটির বিকাশ ও বিস্তারে যে পরিমান গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং গুরুত্ব প্রদানের প্রেক্ষাপটে যে ফললাভ হচ্ছে তা নিতান্তই অপ্রতুল। এতে মানুষের বৈষয়িক উন্নয়ন কিছুটা হয়তো হচ্ছে কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও ভালবাসা বস্তুগত অর্জনের কাছে প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছে। মানবিক বিপর্যয়ের চালচিত্র প্রতিদিনই প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ পাচ্ছে, যা মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি মৌলিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া; যা সমগ্র সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে একটি সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ভৌত কাঠামো, পাশাপাশি সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ব্যবস্থা ও জীবনধারণ পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়।

১৯৯১ সালে মানব উন্নয়নের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নির্দিষ্ট হয়। এগুলো হলো-মানুষের উন্নয়ন, মানুষের দ্বারা উন্নয়ন এবং মানুষের জন্য উন্নয়ন। মানুষের উন্নয়ন হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সামাজিক কল্যাণে বিনিয়োগ করা। উন্নয়নে পূর্ণ অংশগ্রহণ ও প্রয়োগ হলো মানুষের দ্বারা উন্নয়ন আর মানুষের জন্য উন্নয়ন হলো প্রতিটি মানুষের চাহিদা, আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। সাধারণ কথায়, মানব সম্পদ উন্নয়নকে বলা হয় Resource Development of Human (HRD) অর্থাৎ উন্নয়ন হবে সম্পূর্ণ মানব কেন্দ্রিক; মানুষ নিজেরা নিজেদের দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ঘটাবে এবং নিজেরাই তার ফলভোগ করবে।[১]

গবেষকগণ কেউ কেউ মানবসম্পদ উন্নয়নকে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেখিয়েছেন যা কর্ম-কৃতিত্ব উন্নয়ন বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। তারা বলেছেন, মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো কর্ম-কৃতিত্ব উন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংগঠিত শিক্ষা অভিজ্ঞতা। এই ইউনিটে মানব সম্পদ উন্নয়নে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকাকে ৬টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে-

- পাঠ- ৪.১: মানব সম্পদ উন্নয়ন এর ধারণা ও নীতিসমূহ
- পাঠ- ৪.২: মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা, সাক্ষরতা এবং জীবন দক্ষতার ভূমিকা/প্রভাব
- পাঠ- ৪.৩: মানব সম্পদ উন্নয়নে মাধ্যমিক শিক্ষার ভূমিকা
- পাঠ-৪.৪: মানব সম্পদ উন্নয়নে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা
- পাঠ-৪.৫: মানব সম্পদ উন্নয়নে নারী শিক্ষার ভূমিকা
- পাঠ-৪.৬: মানব সম্পদ উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষার ভূমিকা

---

[১] ড. মো: নুরুল ইসলাম, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ঢাকা তাসমিয়া পাবলিকেশনস, ২০১২,পৃষ্ঠা ১২৩

পাঠ ৪.১ : মানব সম্পদ উন্নয়ন এর ধারণা ও নীতিসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উন্নয়ন কী তা বলতে পারবেন;
- সম্পদ কী সেটা বলতে পারবেন;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- মানব সম্পদ উন্নয়ন এর সাথে জড়িত নীতিসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

উন্নয়ন

উন্নয়ন বলতে কী বুঝায় এ প্রশ্নের জবাব দেবার একটি উপায় হচ্ছে উন্নত এবং অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলোর একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা। সাধারণভাবে অনুন্নত দেশগুলোর জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের মধ্যে আয় এত কম যে জীবনের আবশ্যিক প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এর সংস্থান করাই তাদের জন্য কষ্টকর। শিক্ষার প্রসার কম, পুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে বেশিরভাগ লোকই বিভিন্ন ধরনের রোগে ভোগেন। অস্বাস্থ্যকর আবাসান, অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা এ সবই হচ্ছে অনুন্নত দেশের সার্বিক চিত্র।

অপরদিকে, উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের মধ্যে আয়ের বৈষম্য থাকলেও জনসংখ্যার বিরাট অংশই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ন্যূনতম মান বজায় রাখতে পারে। সব লোকেরই নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে, পুষ্টির মান ভাল হওয়ায় জনগণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন-এসব অবকাঠামোর অবস্থা ভাল।

উপরের তুলনামূলক আলোচনা থেকে উন্নয়ন সম্পর্কে মোটামোটি একটি ধারণা বা চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, সেটি হচ্ছে- উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি দেশের মানুষ তাদের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) মেটানোর সাথে সাথে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মানও বাড়াতে পারেন। ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি দেশের সার্বিক অবকাঠামোর (যেমন- রাস্তাঘাট, আবাসন, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ) উন্নয়ন ঘটে।

উন্নয়নের একটি গ্রহণীয় সংজ্ঞা নির্ধারণ খুবই কঠিন। কারণ এক এক তাত্ত্বিক এক এক ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন- অর্থনীতিবিদরা সব সময়ই উন্নয়নের সংজ্ঞার মধ্যে অর্থনীতিকে টেনে এনেছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা উন্নয়নের সংজ্ঞার মধ্যে সমাজের উন্নয়নকে জোর দিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানীরা উন্নয়নের সংজ্ঞার মধ্যে মানুষের মন-মানসিকতার উন্নয়নকে জোর দিয়েছেন। প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীরা উন্নয়নের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের ওপর জোর দিয়েছেন। নৃ-বিজ্ঞানীরা উন্নয়নের সংজ্ঞার মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে দেখা যায়, কেউই উন্নয়নের সর্বজনীন ও গ্রহণীয় সংজ্ঞা দিতে পারেননি। প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সমাজ বা দেশের প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এখন দেখা যাক বিভিন্ন তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নের অতীত ও বর্তমানের সংজ্ঞা, যা উন্নয়নের গ্রহণীয় সংজ্ঞা সম্পর্কিত ধারণাকে আরো স্পষ্ট করবে।

অর্থনীতিবিদরা উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, উন্নয়ন হলো কোনো দেশ বা সমাজে যদি মুক্ত অর্থনীতির কাঠামো বিরাজমান থাকে তবেই ওই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। কারণ তারা মনে করেন, এ অবস্থা সমাজ বা দেশে বিরাজমান থাকলে ব্যক্তিস্বার্থ উন্নয়নে সবাই আগ্রহী হবেন। আর এ জন্য সমষ্টিগত স্বার্থের উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হয়ে উঠবে।

মার্কসবাদীরা বলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর উপনিবেশবাদ দূর করতে পারলে এবং সুষম বণ্টন করতে পারলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যে পরিবর্তন সংঘটিত হবে তা-ই উন্নয়ন। পশ্চিমা দেশগুলোর পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থা পুনর্গঠন করে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হলেই উন্নয়ন সম্ভব।

আবার পুঁজিবাদীরা বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই হলো উন্নয়ন, যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার স্থান এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যক্তিমালিকানায় রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে উন্নয়ন করার কথা বলা হয়েছে। উন্নয়নের এসব সংজ্ঞা তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। লব্ধ ও অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে উন্নয়নের গ্রহণীয় সংজ্ঞা হতে পারে।

'উন্নয়ন' শব্দের অর্থ হলো উন্নতি হতে যাচ্ছে এমন অর্থাৎ উন্নয়ন হলো পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া, যা বস্তুগত ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোনো সমাজ বা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক, চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ইত্যাদির পরিবর্তন (উন্নতি) হওয়াই হলো উন্নয়ন। এসব বিষয়ের সুসংগঠিত কাঠামো গঠনপূর্বক উৎপাদনমুখী প্রযুক্তি ব্যবহার, শ্রম, মেধা ও পুঁজির সঠিক প্রয়োগসম্বলিত ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত সুফল সমাজ বা দেশের জনগণের চিন্তা-চেতনায় যৌক্তিকভাবে নিবেদন করলে জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক যে উন্নতি সাধন হয় তা-ই হলো উন্নয়ন। এ উন্নয়ন প্রত্যয়টি শুধু Economic নয় বরং Human Problem-ও বটে। উন্নয়নের সঙ্গে যেমন সমাজ ও মানুষ জড়িত, তেমনি Non-economic Factor-ও সম্পৃক্ত। অর্থাৎ উন্নয়ন শুধু পরিমাণগত, পরিমাপগত ও সাংখ্যিক উন্নতি নয় বরং Values, Tradition, Arts, Problem এবং Culture ইত্যাদি বিষয়ও উন্নয়ন প্রত্যেয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতএব আমরা বলতে পারি উন্নয়ন হলো কোনো সমাজ বা দেশের নাগরিকদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয়ের উন্নতি সাধন, যেখানে সব বিষয় সমান গুরুত্ব পায়।

সম্পদ

সাধারণত সম্পদ বলতে টাকাপয়সা, ধন-দৌলত প্রভৃতিকে বোঝায়। কিন্তু সম্পদ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে সম্পদ হলো, যা কিছু মানুষের অভাব পূরণ করে ও যার জোগান অপ্রতুল। এ অর্থে সকল প্রকার অর্থনৈতিক দ্রব্যকেই সম্পদ বলা যায়। তবে সম্পদ হতে হলে অবশ্যই বিনিময়মূল্য থাকতে হবে। অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে কেনাবেচা করা যায় এমন বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যকে সম্পদ বলে। সুতরাং যেসব দ্রব্যের উপযোগ রয়েছে, জোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ যা হস্তান্তরযোগ্য এবং বাহ্যিক সত্তার অধিকারী, তাকেই অর্থনীতিতে সম্পদ বলা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়ন কথাটির মানে কি তা আগে আলোচনা করা দরকার। হাংগেরির বুদাপেষ্টের এক সম্মেলনে বলা হয় যে, আধুনিক অর্থে মানব সম্পদ উন্নয়ন হল মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, অর্থাৎ উৎপাদন কর্মে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে মানুষের কারিগরি দক্ষতা বা ব্যবহারের উপযোগিতা বৃদ্ধিকরণ।

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০১ এ বলা হয়েছে, It is about creating an environment in which people can develop their full potential and lead productive ,creative lives in accord their needs and interest.

শিক্ষা ও উন্নয়ন

শিক্ষা এমন এক মাধ্যম যার সাহায্যে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে। এ কারণেই শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি বলা হয়েছে। শিক্ষা মানুষের জ্ঞান-অভ্যাস,আচরণ ও মূল্যবোধকে প্রভাবান্বিত করে। শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জিত হয়। তাই The World Book of Encyclopedia-তে বলা হয়েছে, Education is the process by which people acquire knowledge, skills, habits, values and attitudes. আরও বলা হয়ে থাকে যে, Education is key for the development.

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল তিনটি- যার একটি হল মানুষের দৈহিক ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যক্তির ভিতর মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ও চরিত্র গঠন এবং সার্বজনীন ও শাশ্বত একটি প্রেরণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। শিক্ষা ছাড়া একটি জাতি কখনও দাড়াতে পারবে না। শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক দৈন্য এড়াতেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা, ভূমি ও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার এবং আর্থসামাজিক ক্ষমতায়নে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে। তাছাড়া শিক্ষাগত অর্জনকে গতিশীল সামাজিক সচলতার শক্তিশালী উপকরণ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। একে সামাজিক মই (Ladder)-ই বলা চলে। শিক্ষা উন্নয়নের একটি মুখ্য হাতিয়ার। এ কথা ঠিক যে, সবার জন্য গুণগত মানের শিক্ষা, বৈষম্যহীন ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে যেকোনো জাতির উন্নয়ন হবেই। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে একটি দেশে জাতীয় আয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়, দারিদ্র্য বিমোচন হয় তথা উন্নয়ন সহজতর হয়। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ভূমি ও অন্যান্য বৈষয়িক সম্পদের অধিকতর কার্যকর ব্যবহার, প্রযুক্তি ও দক্ষতা ভিত্তিক পণ্যের অধিক রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করে। শিক্ষা ও দারিদ্র্যের মধ্যে নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। একটি দেশে বা পরিবারে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়লে সেই দেশ বা পরিবারের দৈন্য কমে। দারিদ্র্য রেখার উপরিভাগ প্রশস্ত হয়। সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার ইতিবাচক ভূমিকা আখেরে অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করে। ব্যাষ্টিক এবং সামষ্টিক উভয় পর্যায়েই শিক্ষা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। ব্যষ্টিক পর্যায়ে দেখা যায়, নিরক্ষর ব্যক্তি কিংবা তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য কম উৎপাদনশীল হয়; কম আয়ের কাজে নিযুক্ত থাকে এবং দারিদ্যসীমার নিচে বাস করে। সামষ্টিক পর্যায়ে দেখা যায়, নিরক্ষর জাতি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন বাড়াতে পারে না এবং তাদের জীবনযাত্রার মান নিচু হয়। তাছাড়া শিক্ষা অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনের মানও বাড়ায়। বাংলাদেশেও শিক্ষিত জনগণের চেয়ে নিরক্ষর জনগণের মধ্যে দারিদ্র্য প্রায় সাত গুণ (৬.৭) বেশী। পরিবার প্রধানের কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এমন পরিবারের দারিদ্যের মাত্রা উচ্চ শিক্ষিত পরিবার প্রধানের পরিবার থেকে কম করে হলেও ৬ থকে ৭ গুণ বেশি। শুধুমাত্র উপযুক্ত শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে পারলে কম করে হলেও গ্রামীণ গরিব মানুষের ৫৭ শতাংশের ভাগ্য বদলে দেয়া সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উন্নয়ন বলতে বোঝায়-
ক. কোন দেশের সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন
খ. কোন দেশের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি
গ. কোন দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকরণ
ঘ. উপরের সব কয়টি

২. অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ হচ্ছে-
ক. টাকা পয়সা যা দিয়ে কেনাবেচা করা যায়
খ. ধন-দৌলত যা দ্বারা ধনী-গরীবের মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়
গ. বস্তুগত জিনিস যার দ্বারা অভাব মেটানো যায়
ঘ. বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য যা হস্তান্তরযোগ্য ও বিনিময় মূল্য আছে

৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে বোঝায়-
ক. মানুষের বুদ্ধিগত পরিসর বৃদ্ধি
খ. মানুষের বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধি
গ. মানুষের মননশীলতার উন্নয়ন
ঘ. মানুষের সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতার উন্নয়ন

উত্তরমালাঃ ১। ঘ; ২। ঘ; ৩। ঘ।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা নিরুপন করুন।

পাঠ ৪.২ : মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা, সাক্ষরতা এবং জীবন দক্ষতার ভূমিকা/প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারবেন;
- মানব সম্পদ উন্নয়নে মৌলিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- জীবন দক্ষতা ও জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা কী তা বলতে পারবেন এবং
- জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার সাথে মানব সম্পদ উন্নয়ন এর ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে পারবেন।

মৌলিক শিক্ষা বা বুনিয়াদি শিক্ষা (Basic Education)

মৌলিক বা বুনিয়াদি শিক্ষা সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত। সাক্ষরতা মৌলিক শিক্ষার প্রথম সোপান। শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় সাক্ষরতা অর্জন ও গাণিতিক সাক্ষরতা অর্জন অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের চারটি ভাষা দক্ষতা ও গাণিতিক প্রাথমিক দক্ষতা (Four language skills and numerical skills) আয়ত্ত করতে হয়। সাধারণত প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে এ সাক্ষরতা অর্জন ও এর অনুশীলন হওয়ার কথা। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সাক্ষরতা দক্ষতাকে সুসংহত বা স্থিতিশীল করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয় যেমন, শুদ্ধভাবে শোনা ও বুঝতে পারা, শুদ্ধভাবে বলতে পারা, শুদ্ধভাবে পড়তে পারা ও মর্মার্থ উপলব্ধি করা, শুদ্ধভাবে লিখতে পারা বা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা। সাথে সাথে গাণিতিক সাক্ষরতাও সুসংহত করা যাতে শিক্ষার্থীরা গাণিতিক বিষয়ে দক্ষতা দেখাতে পারে। এসব দক্ষতাকে বলা হয় অত্যাবশ্যকীয় শিখন হাতিয়ার (Essential learning tools) অর্থাৎ একজন মানুষ তার অর্জিত দক্ষতাকে শেখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সারাজীবন শেখার কাজ অব্যাহত রাখতে পারবে। এছাড়া মৌলিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ শিখন বিষয়বস্তুর (Learning Contents) অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এরূপ জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যা সাহায্য করে মানুষের জীবনযাপনে, মর্যাদাসহ বাঁচতে ও কাজ করতে, উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে, জীবনের গুণগত মান উন্নয়নে এবং জেনে শুনে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে ও স্বশিক্ষায় নিয়োজিত হতে। মৌলিক শিক্ষার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনদক্ষতা (life skills) আয়ত্ত করা অর্থাৎ এরূপ জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন যা শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং পারিবারিক, সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রের সমস্যা মোকাবিলায় (Problem Solving) সহায়ক।[2] মৌলিক শিক্ষা যেভাবে মানুষের সক্ষমতা (Empowerment/Capacity) বৃদ্ধি করে মানুষকে মানব সম্পদে পরিণত সাহায্য করে:

- ব্যক্তির আত্মসম্মান বাড়ায়;
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যবিধি পালন ও পুষ্টিমান রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে;
- নারীর অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়;
- মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে;

[2] আবু হামিদ লতিফ, শিক্ষা শিখন শিক্ষণ প্রশিক্ষণ, প্রকাশক- লেখক নিজে, প্রিন্স টাওয়ার,শাহবাগ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৩

- সব ধরনের বৈষম্য ও শোষণ থেকে উত্তরণে সাহায্য করে;
- ব্যক্তির আয়বর্ধনে ভূমিকা রাখে;
- ব্যক্তির জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি করে;
- সাক্ষর ব্যক্তি চিঠি লিখতে পারে, সাইনবোর্ড বা সাইনপোস্ট পড়তে পারে, ফরম পূরণ করতে পারে;
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়;
- গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করে।

মৌলিক শিক্ষা বলতে বোঝায় (Basic learning needs+basic learning content: knowledge, skills including life skills, values and attitudes) জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদক্ষতা যা মানুষকে দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং পারিবারিক, সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের মোকাবিলায় সহায়ক।

জমতিয়েন (Jumtein, Thailand)-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে মৌলিক শিক্ষার যেসব সম্প্রসারিত দূরলক্ষ্য (Expanded Vision) নির্ধারণ করা হয় তা নিম্নরূপঃ

- স্কুলে প্রবেশাধিকার সর্বজনীন করা এবং সমতা/ন্যায্যতা নিশ্চিত করা; (Universalizing access and promoting equity)
- শিখনের ওপর গুরুত্বারোপ করা (Focusing on Learning)
- মৌলিক শিক্ষার উপায় ও পরিসর প্রসারিত করা (Broadening the means and scope of basic education)
- শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন করা এবং (Enhancing the environment for learning)
- শিক্ষা ক্ষেত্রে অংশীদারীত্ব দৃঢ় করা। (Strengthening partnerships)

২০০০ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম (World Education Forum) অনুষ্ঠিত হয়। 'সবার জন্য শিক্ষা' সম্পর্কিত এটি দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলন। সম্মেলনে পৃথিবীর ১৮০টিও বেশি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত জমতিয়েন বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনের পর বিগত দশ বছরে বিশ্বব্যাপী সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের অগ্রগতির মূল্যায়ন এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

ডাকার সম্মেলনে ২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য নিম্নলিখিত ছয়টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়[৩]:

১. শিশু যত্ন, বিকাশ ও পূর্বপস্তুতিমূলক শিক্ষা; বিশেষ করে বিপন্ন ও অসুবিধাগস্থ্ শিশুদের জন্য, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ব্রতী হওয়া;
২. আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে সব ছেলেমেয়ের জন্য, মেয়েদের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে, মানসম্মত বিনা বেতনের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চত করা; এই শিক্ষায় অনগ্রসর বা অজ্ঞতা রয়েছে এমন ছেলেমেয়ে এবং সংখ্যালঘুদের ছেলেমেয়েদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;
৩. যুব সমাজ ও বয়স্কদের শিখন চাহিদা পূরণের জন্য গৃহীত যথাযথ জ্ঞানমূলক ও জীবন দক্ষতাসম্পন্ন কার্যক্রমে সকলের সমতাভিত্তিক যোগদান নিশ্চিত করা;

[৩] আবু হামিদ লতিফ, শিক্ষা শিখন শিক্ষণ প্রশিক্ষণ, প্রকাশক- লেখক নিজে, প্রিন্স টাওয়ার, শাহবাগ, ঢাকা। পৃষ্ঠা ১৬, ১৭

৪. আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতা বর্তমান পর্যায় থেকে আরও ৫০ শতাংশ অগ্রগতি সাধিত করার বিষয়ে জোর দেয়া, বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে এবং মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষায় বয়স্ক লোকদের প্রবেশের সম-সুযোগের বিষয়ও নিশ্চিত করা;
৫. আগামী ২০০5 সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে জেন্ডার বৈষম্য নির্মূলকরণ এবং ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং এ বিষয়ে লক্ষ্য থাকবে মানসম্মত মৌলিক শিক্ষায় মেয়েদের পূর্ণ ও সমান প্রবেশাধিকার এবং শিক্ষার্জন;
৬. গুণগত শিক্ষার সকল দিকের উন্নয়ন করা এবং সকলে যাতে তা থেকে লাভবান হয় তা দেখা এবং গ্রহণযোগ্য পরিমাপকের মাধ্যমে শিক্ষার্জন যাচাই করা, বিশেষ করে সাক্ষরতা, গাণিতিক সাক্ষরতা ও জীবনদক্ষতা।

আশা প্রকাশ করা হয় যে, ডাকার সম্মেলনের লক্ষ্যসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

‘সবার জন্য শিক্ষার’ সুযোগ-সুবিধা দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। সরকার এ দায়িত্ব প্রধানত পালন করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে ‘সবার জন্য শিক্ষা’ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারায় বাস্তবায়িত হয়। ‘সবার জন্য শিক্ষা’র কার্যক্রম সফল বস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত অর্জনসমূহ হচ্ছে:

- সকল শিশুর প্রবেশাধিকার নিশ্চিকরণ (Access to education)
- সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিকরণ (Ensure equality and equity)
- শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতরকণ (Quality assurance)
- শিখনের ওপর গুরুত্বারোপ (Emphases on learning)
- জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ (Removal of gender disparity/bring gender equality)
- জীবনভর বা জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি (Opportunities for lifelong education)
- শিখন সমাজের গোড়াপত্তন (Establishment of learning society)

ফ্রেডারিক হার্বিসন, চালর্স ও মায়ার্স এর মতে, মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোনো সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মানব সম্পদ উন্নয়ন হলো জনসম্পদের এমন এক গুণগত পরিবর্তন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তার জনসম্পদ উৎপাদনক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধিঞ্চুভাবে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে এবং মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যে সর্বোত্তম বিকাশে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং মানব সম্পদ উন্নয়ন সকল উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমেই। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকেই আমরা সে শিক্ষাই পাই। মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আর মানব সম্পদ উন্নয়ন ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ প্রবাহিত করে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই অর্জন করেছে তা নয়, এর ফলে সামাজিক সাম্য অর্জিত হয়েছে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে, আয়ের বৈষম্য কমেছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, স্বাস্থ্য সুবিধা বেড়েছে এবং জীবনের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে।

জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (Life skills based Education)

বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা বা World Health Organization (WHO) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী জীবন দক্ষতা বা Life skills হচ্ছে-

"Life skills are abilities for adaptive and positive behaviors that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life".

জীবন দক্ষতা হচ্ছে সেইসব দক্ষতা যা সুস্থ, সুখি, নিরাপদ জীবনের জন্য অপরিহার্য। মানসিক দৃঢ়তা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের মাধ্যমে মানুষ প্রতিদিন বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মনোবৃত্তিক দক্ষতাগুলোকে জীবন দক্ষতা বলা হয়। জীবন দক্ষতা শিক্ষার্থীদের মনোসামাজিক সমস্যা উত্তরণের সক্ষমতা দেয় সেজন্য এগুলোকে বলা হয় মনোসামাজিক দক্ষতা (Psychosocial skills)।

জীবিকা অর্জন দক্ষতা আর জীবন দক্ষতা এক নয়। জীবিকা অর্জন দক্ষতা হচ্ছে জীবিকা অর্জনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত দক্ষতা। আর্থিক আয় সংক্রান্ত সক্ষমতা, ব্যক্তিগত ও পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোকে জীবিকা অর্জন দক্ষতা।

জীবন দক্ষতা হচ্ছে মনোসামাজিক দক্ষতা এগুলো জীবিকা অর্জনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয় কিন্তু এ দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীও অন্তর্নিহিত সকল সম্ভবনার ও বিকাশ ঘটিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফল হওয়ার ভিত্তি তৈরি করে দেয়'।

জীবন দক্ষতার ধারণাটির স্বাস্থ্যর সাথেও সম্পর্কিত। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, প্রাণবন্ত এবং কর্মময় জীবন নিশ্চিত করা জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক- সব ধরনের সুস্থতাই প্রয়োজন।

'জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা এমন একটি শিখন অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষণ-শিখন এ্যাপ্রচ যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবন দক্ষতাসমূহ অর্জন ও আয়ত্ত করতে পারে'।

জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা কেন মৌলিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত

বিশ্বের সকল দেশের কিশোর-কিশোরীদের মত আমাদের ছেলেমেয়েরাও বর্তমানে এই সমস্যা স্কুল সময়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জ, সমস্যা ও যন্ত্রণা মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিপন্ন ও অসহায়। বিশেষত উপরোক্ত মনোসামাজিক সমস্যাগুলো উত্তরণে তারা কারো কাছ থেকে কোন সহায়তা পায় না। স্কুলগামী কিশোর-কিশোরীদের সহায়তা প্রদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে স্কুল, সবচেয়ে বড় সহায়ক হচ্ছেন শিক্ষক, মা-বাবা এবং সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচেছ পাঠ্যপুস্তক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক শনাক্তকৃত ১০টি জীবন দক্ষতা নিম্নরূপ:

১. **আত্মসচেতনতা:** নিজ সবলতা ও দুর্বলতা, গুণাবলী ও ত্রুটিসমূহ, দায়িত্ব ও কর্তব্য, অধিকার ও মূল্যবোধ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা সৃষ্টির সামর্থ্য। গুণাবলি উন্নয়ন ও ত্রুটিসমূহ দূরীকরণে সচেতনতা। আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির সামর্থ্য।

২. **সহমর্মিতা:** ভিন্ন শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থার মানুষের অবস্থা ও চাহিদা যথাযথভাবে বোঝা, তার কথা শোনা এবং তার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনে সক্ষমতা।

৩. **আন্তব্যক্তিক দক্ষতা:** সম্পর্ক স্থাপন করা, বজায় রাখা ও উন্নয়নের সামর্থ্য। সম্পর্ক ছেদ করতে হলে তা করার সক্ষমতা। নিজের যুক্তিসংগত মত প্রতিষ্ঠা করা, অন্যায় ও অনাকাঙ্খিত চাপ প্রত্যাখ্যান করা, অন্যকে ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে প্রভাবিত করার সামর্থ্য।

৪. **যোগাযোগ দক্ষতা:** নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা। অন্যের কথা মনোযোগের সাথে এবং সক্রিয়ভাবে শোনার দক্ষতা। অন্যকে দোষারোপ না করে এবং অন্যের মনে কষ্ট না দিয়ে কথা বলার সক্ষমতা।

৫. **বিশ্লেষণমূলক চিন্তন দক্ষতা:** প্রভাব তথ্য ও পরিস্থিতি, বিজ্ঞাপন, বিবৃতি ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার দক্ষতা। বিশ্লেষণলব্ধ ফলাফল জীবনের সমস্যা উত্তরণে কাজে লাগানোর দক্ষতা।

৬. **সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা:** কোন পরিস্থিতি বা বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রদান ও নতুন ধারণা সৃষ্টির সামর্থ্য। কর্ম সম্পাদনের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের সক্ষমতা।

৭. **সমস্যা-সমাধান দক্ষতা:** সমস্যার উৎস চিহ্নিত করা এবং এর প্রকৃতি ও মাত্রা অনুধাবন করার ক্ষমতা । সহজ এবং গঠনমূলকভাবে সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য।

৮. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা:** যথাযথভাবে কোন পরিস্থিতি অনুধাবনের দক্ষতা। বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা।

৯. **চাপ মোকাবেলার দক্ষতা:** মানসিক চাপের উৎস, প্রকৃতি ও মাত্রা সনাক্ত করার দক্ষতা। চাপের তীব্রতা হ্রাস করার সামর্থ্য।

১০. **আবেগ সামলানোর দক্ষতা:** অনুভুতির উপর যুক্তিকে প্রাধান্য দেবার ক্ষমতা। মানসিক অবস্থাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে সহজ ও ইতিবাচক সমাধানে পৌঁছানোর সামর্থ্য।

জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হতে, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে, সুক্ষ্ম ও সৃজনশীল চিন্তনে, কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টিতে, সুস্থ সম্পর্ক গড়তে, অন্যের প্রতি সহমর্মী হতে এবং চাপ ও আবেগ মোকাবেলায় সমর্থ করে তোলে। এর ফলে ছেলেমেয়েরা ইতিবাচক আচরণ আত্মস্থ করার মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজস্ব সকল সম্ভাবনার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনে সক্ষমতা দেয় এবং সে নিজের, পরিবারের, গোষ্ঠির এবং সমাজের উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

জীবন দক্ষতা অর্জনের সূচকগুলো নিম্নরূপ:

যখন কোন শিক্ষার্থী[৪]-

- বিপদজনক পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে ও এড়াতে পারবে;
- আত্মউন্নয়ন ঘটাতে পারবে;
- অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে;
- অপরের দুঃখ-কষ্ট-বিপদে সহমর্মিতা প্রকাশ করবে;
- নিজের মনোসামাজিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে;
- নিজ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে পারবে; নিজে নিরাপদ থাকতে সক্ষম হবে, অন্যের নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করবে;
- অন্যের ক্ষতি না করে নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে;

[৪] প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচি-জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ, ঢাকা। জুলাই ২০১২, পৃষ্ঠা ৩০ ।

- নিজেকে বিভিন্ন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারবে;
- সবসময় ইতিবাচক আচরণ করতে সমর্থ হবে;
- ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।

সুতরাং জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিক কখনো বেকাররূপে সমাজের বোঝা না হয়ে বরং সমাজে তথা রাষ্ট্রে ইতিবাচক অবদান রাখার মাধ্যমে নিজকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ করে গড়ে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মৌলিক শিক্ষা কোন শিক্ষাস্তরের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত-
ক. উচ্চ শিক্ষাস্তর
খ. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর
গ. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাস্তর
ঘ. প্রাথমিক শিক্ষাস্তর

২. বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম কত বছর মেয়াদী-
ক. ২ বৎসর
খ. ৩ বৎসর
গ. ৫ বৎসর
ঘ. ৮ বৎসর

৩. শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের আওতাভূক্ত করার জন্য নিচের কোনটি সর্বাগ্রে করা দরকার?
ক. শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো
খ. শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান বাড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া
গ. পাঠ্যপুস্তকের মান বাড়ানো ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করা
ঘ. সকল শিশুর প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা

উত্তরমালা: ১। ঘ; ২। গ; ৩। গ।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানবসম্পদ উন্নয়নে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা মৌলিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৪.৩: মানব সম্পদ উন্নয়নে মাধ্যমিক শিক্ষার ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাধ্যমিক শিক্ষার প্রান্তিক অর্জন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন এর সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে কোনো দেশকে টিকে থাকতে হলে সে দেশকে অবশ্যই মানব সম্পদের দিক থেকে উন্নত হতে হবে। এই কথা শুধু দেশের ক্ষেত্রেই নয় বরং সমাজ ও ব্যক্তিকভাবেও অনস্বীকার্য। আর তাই দেশ হিসেবে প্রথমেই নজর দিতে হবে দেশের সাধারণ নাগরিকদের প্রতি যাদেরকে কর্মদক্ষ করে তুলতে হবে। কর্মদক্ষতা সৃষ্টি নিয়ে ভাবতেই চলে আসবে শিক্ষার বিষয়টি। যা প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। শিক্ষার মাধ্যমেই প্রত্যেকে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত হয়। আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিকভাবে এটি অর্জনের সুযোগ থাকলেও যুগ প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্জন বলতে আমরা আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জনকেই বুঝে থাকি। প্রত্যেক ব্যক্তিই উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে তার মনে লালন করা ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোনো কর্ম খুঁজে নেয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য:

১. শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ, কর্মক্ষম ও উৎপাদনক্ষম জনশক্তি গড়ে তোলা;
২. শিক্ষাকে জীবনমুখী, কর্মমুখী ও প্রয়োগমুখী করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা;
৩. শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
৪. শিক্ষার্থীকে তার মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা;
৫. একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে গড়ে তোলার মানসে শিক্ষার্থীদেরকে নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করা;
৬. শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীর মানসিক ও সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন।

নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ: (জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী)

- শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।
- কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য, বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।
- মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। এর ফলে
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার ভিত শক্ত হবে।
- বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া
- গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর জন্যও যতদিন
- প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা।
- নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারায় অভিনব শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শের নিরিখে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সুসংহত, সুদৃঢ় এবং সম্প্রসারিত করা;
- শিক্ষার্থীকে তার মৌলিক চিন্তা, কল্পনা ও সৃজন ক্ষমতাকে মাতৃভাষায় সুন্দর সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পারার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা;
- দৈনন্দিন ও পেশাগত প্রয়োজন মেটাবার জন্য গণিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা;
- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যথা- পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, পরিমাপন, পরীক্ষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ও অনন্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা, এগুলো অর্জনে সহায়তা করা এবং দৈনন্দিন জীবনে এগুলোর ব্যবহারে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা;
- শিক্ষার্থীর মনে তার আশেপাশের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করা। দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করা;
- শিক্ষাকে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে তার আশেপাশে সকলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা;
- হাতে-কলমে কাজ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরিবেশের বস্তু ও ঘটনার ওপর অনুসন্ধানী কার্যক্রম চালিয়ে শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা ও কৌতুহল মেটানো ও তাদের সক্রিয়তায় সাহায্য করা;
- গাণিতিক যুক্তি এবং এর প্রয়োগে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা;
- সমাজের নানা সংকট সম্পর্কে অর্জিত ধারণার ভিত্তিতে নতুন সমাজ গঠনে শিক্ষার্থীদের সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত করা;
- বর্তমানকে অতীতের আলোকে বিশ্লেষণ করে ভবিষৎ গড়ে তোলার পথ নির্দেশ দেয়া;
- মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষানীতির আলোকে ও জাতীয় রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বা আদর্শের নিরিখে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক স্তর শেষে একজন নাগরিক নিম্নোক্ত দক্ষতা অর্জনে সক্ষমতা অর্জন করবে।[৪]

- নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলবে।
- নিজের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠবে ও সচেতন হবে।

- প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে।
- নিজ অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে ও অন্যের অভিজ্ঞতা জানার স্পৃহা হবে ভাল ও মন্দ যাচাইয়ে সক্ষম হবে।
- উপযুক্ত পেশায় নিজেকে নিয়োগ করতে সক্ষমতা অর্জন করবে।
- পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে ও অনুশীলনে আগ্রহ প্রদর্শনে সক্ষম হবে।
- উচ্চ শিক্ষায় বিষয় নির্বাচনে নিজ মেধা ও আর্থিক সঙ্গতির কথা বিবেচনা করতে সক্ষম হবে।
- সেবামূলক কাজে স্বত:স্ফুর্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে।
- যৌক্তির চিন্তা করতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হবে।
- সমস্যা মোকাবেলায় কৌশলি হবে।
- আত্মকর্মসংস্থান করার সামর্থ্য অর্জন করবে।
- অভিযোজনের কলা-কৌশল প্রয়োগে সক্ষম হবে।
- পারিবাবিক ও সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হবে।

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে পারিবারিক স্বার্থে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম পুরোপুরিভাবে এখনও কর্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেনি। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য দরকার দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক যারা সর্বোতভাবে বিশ্বাস করবে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রমের মূল দর্শনকে। এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নে হবেন স্বত:প্রণোদিত। স্কুল পরিবেশ হতে হবে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপযোগী। নিজ দেশ ও বিদেশে কর্মচাহিদার উপর নির্ভর করে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাভিত্তিক প্রজেক্ট শিক্ষার্থীদের দিয়ে করাতে হবে। ফলে শিক্ষার্থীরা দক্ষ জনশক্তি তথা মানবসম্পদে পরিণত হবে। বাস্তবে আমরা দেখছি মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও জাতীয় শিক্ষানীতি মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের যে সকল আদর্শে ও লক্ষ্যে পরিচালিত করে এই স্তরের শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে চাচ্ছে সেটা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এ স্তরের শিক্ষার্থীদের মানবসম্পদে পরিণত করতে হলে এই স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষিত ও নিবেদিত পরিবীক্ষক দ্বারা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করালে আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া যেতে পারে। ড: কুদরত ই খুদা শিক্ষা কমিশনে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোতাবেক যদি মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হতো বাংলাদেশ তাহলে আজ এত তীব্রভাবে বেকার সমস্যা দেখা যেত না, এরা বহির্বিশ্বে শ্রমবাজারে দক্ষ কারিগর ও শ্রমিক হিসেবে নিজেদের জায়গা করে নিত ও বাংলাদেশ সরকার আয় করতো প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা যা অদক্ষ শ্রমিকের আয়ের বহুগুণ বেশি এবং এরা সমাজের বোঝা না হয়ে সম্পদ তথা আশির্বাদ হিসেবে পরিগণিত হতো। যদিও বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হলে মাধ্যমিক স্তরের প্রান্তিক শিক্ষিত নাগরিকগণ শুধু অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান করে নেয়া শুধু নয়, আত্মকর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করতে পারবে। তবে শিক্ষাক্রমটি হতে হবে কর্মভিত্তিক ও প্রয়োগমুখী। সেই সাথে সমাজের মানুষকে শ্রম মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তুলতে হবে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর ভিতরে কায়িক শ্রম, পারিবারিক পেশাকে সম্মানের চোখে দেখা ও পারিবারিক পেশার আধুনিকায়ন ও জাতীয়ভাবে এর গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলায় উদ্দ্যোগী হতে হবে। উদ্দ্যোগ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট বাস্তবায়নে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। যারা প্রান্তিক শিক্ষার পর স্ব উদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থান এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের কর্মজীবনের সফল কাহিনী প্রচারের ব্যবস্থা করা। জীবনের যে কোন পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা নেবার পথ খোলা রাখা যাতে প্রান্তিক মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে কর্মজীবনে নির্ধারিত পর্যায় শেষে উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে।এর ফলে দেখা যাবে যে, উচ্চ শিক্ষার প্রতি না ঝুঁকে পারিবারিক ও জাতীয় প্রয়োজনে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জোরালো ভুমিকা রাখা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মানব সম্পদ উন্নয়নে মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে-
ক. আরবী ও ইংরেজি ভাষার চারটি দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো
খ. গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ উপযোগী করে গড়ে তোলা
গ. সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কারগুলো অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ভাবে শ্রদ্ধা করতে শেখানো
ঘ. কর্মজগতে অংশগ্রহণের নিমিত্তে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে গড়ে তোলা

২. জাতীয় আদর্শের নিরীখে নিচের কোনটি মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়-
ক. পেশাগত প্রয়োজনে গণিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন
খ. শিক্ষাকে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করা
গ. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা
ঘ. কেবলমাত্র উচ্চ শিক্ষার ভিত তৈরি করা

৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন মাধ্যমিক শিক্ষার কোন যোগ্যতা অধিক কার্যকর -
ক. শিক্ষার্থী আত্মপ্রত্যয়, অধিকার সচেতনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা অর্জন
খ. নিজের দৈহিক সৌন্দর্য্য সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন
গ. সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জন
ঘ. আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করা

উত্তরমালাঃ ১। ঘ, ২। ঘ, ৩। ক।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানব সম্পদ উন্নয়নে মাধ্যমিক শিক্ষার ভুমিকা নিরূপন করুন।

পাঠ ৪.৪: মানব সম্পদ উন্নয়নে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- মানব সম্পদ উন্নয়ন এর সাথে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

[৩]দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ অসম-প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। লক্ষণীয় যে, বর্তমানে গ্রামে কৃষি থেকে শুরু করে যান্ত্রিক নৌকা, যন্ত্রচালিত আখ মাড়াইয়ের মেশিন, রাইস মিল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুতায়ন, পাওয়ার লুম, যন্ত্রচালিত তাঁত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। এগুলোর উন্নতি ছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি (ICT)-ও সংযোজন ঘটাতে হবে। দেশের প্রয়োজন ছাড়াও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই চাহিদা আরো বাড়বে। কাজেই দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় অনেক বৃদ্ধি সম্ভব। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে[৩]। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কৌশল নিম্নরূপ:

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:-

- দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানবসম্পদ দক্ষ জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি করা।

কৌশল: মানব সম্পদকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর কৌশল

১. দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের সকল ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসহ আট বছর মেয়াদি শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।

২. অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ একজন শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ধারায় ভর্তি হতে পারবে। এই ধারায় যারা যাবে তারা যেন ধাপে ধাপে তাদের নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর যারা কোনো মূল ধারায় পড়বে না তারা ছয় মাসের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জাতীয় দক্ষতামান- ১ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় নবম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি সমাপ্ত করে একজন যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

৪. অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর শিল্প-কারখানা এবং উপজেলা ও জেলাপর্যায়ে স্থাপিত সরকারি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট বা বেসরকারি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দেওয়া ১, ২ ও ৪ বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েও যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

৫. এস.এস.সি.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এবং জাতীয় দক্ষতামান-৪ এর সনদধারীরা ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য ডিপ্লোমা/বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (একাদশ-দ্বাদশ)/ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স (একাদশ-দ্বাদশ)/সমমানের কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। তবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৬. কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে যোগ্যতা যাচাই করে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা কোর্সে (ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

৭. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ঃ১২।

৮. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল শিক্ষাক্রমে যথাযথ দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সকল স্তরের শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৯. ১৯৬২ সালের শিক্ষানবিশ আইনকে যুগোপযোগী করে দেশে ব্যাপকভিত্তিতে শিক্ষানবিশ (অ্যাপ্রেনটিসশিপ) কার্যক্রমের প্রবর্তন করা হবে।

১০. প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

১১. সর্বস্তরের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ভিটিটিআই (Vocational Teacher Training Institution: VTTI) ও টিটিটিসি (Technical Teacher Training College: TTTC)-র আসন এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হবে।

১২. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত মানসম্মত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হবে।

১৩. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, লেদার ইনস্টিটিউটসহ এ ধরনের অন্যান্য ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

১৪. মাধ্যমিক স্কুল/বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে কারিগরি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সুসংহত করার জন্য দেশের সমস্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে অধিকতর শক্তিশালী করা হবে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান ও জনবলের ব্যবস্থা করা হবে।

১৬. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হবে।

১৭. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১৮. নতুন নতুন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। তবে এগুলোতে অস্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্বল্প ব্যয়ে পড়ার সুযোগ থাকবে।

১৯. প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও অন্যান্য ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোর্সগুলো দুই শিফটে চালু করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে নির্ধারিত পাঠদান সময় মানসম্মত পর্যায়ে বজায় রেখে এ ব্যবস্থা করা হবে।

২০. বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে সান্ধ্যকালীন ও খণ্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্কুল পরিত্যাগকারী ও বয়স্কদের স্থানোপযোগী বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করে তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করা হবে।

২১. যারা অষ্টম শ্রেণি বা মাধ্যমিক পর্যায়ের যে কোনো শ্রেণির পরবর্তী পর্যায়ে, কোনো (আর্থিক, পারিপার্শ্বিক) কারণে পড়তে অপারগ হয় বা অনাগ্রহ দেখায়, তাদেরকে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং তারা যাতে তাদের নির্বাচিত কারিগরি শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা স্বরূপ উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। যুক্তিসঙ্গত স্বল্পসময়ের মধ্যে এরকম শিক্ষার্থীদের অধিকাংশকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমে নিয়ে আসা হবে।

২২. বেসরকারি খাতে মানসম্পন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে এবং এমপিওভুক্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান এবং যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামসহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

২৩. যে সকল দেশে আমাদের দেশের মানুষ কাজ করতে যায় সে সকল দেশের শ্রম বাজার বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং ঐ সকল দেশের ভাষার ন্যূনতম জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

২৪. দেশ-বিদেশের কর্মবাজারের চাহিদার আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পর্যায়ের সকল কারিকুলাম নিয়মিতভাবে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হবে।

২৫. ভবিষ্যতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।

জাতীয় উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ভূমিকা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ভিশন অভিজ্ঞতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্ম-কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। সর্বোপরি কারিগরি শিক্ষা ছাড়া অধিক জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর করা অসম্ভব।

অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী বলতে আমরা স্বনির্ভর অর্থনীতি, যার অর্থ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ বিষয়ে উপযুক্ত বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক নিজস্ব প্রযুক্তি সম্বলিত উন্নয়ন আবশ্যক, তার ধারাবাহিকতা এবং মাধ্যম হলো কারিগরি শিক্ষা। বিশ্বের উন্নত দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় নিজেকে দক্ষভাবে গড়ে তুলতে হলে এবং দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী করতে হলে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নাই।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন একটি দফতর। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ও সমপ্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সাল থেকে অধিদপ্তর তার নিজস্ব ভবন, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে মহাপরিচালকের অধীনে ৫টি শাখা,

- একটি কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (Technical Teacher Training College) ও
- একটি ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (Vocational Teacher Training Institution) রয়েছে।

অধিদপ্তরের শাখাগুলো হলো:

- প্রশাসন,
- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন,
- প্রোগাম ইন্সপেকশন উইং,
- প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট এবং
- ভোকেশনাল।

বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৮টি আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৩টি টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং, ৪৯টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও মানোটেকনিক ইন্সটিটিউটে ৪ বছর মেয়াদি ২৮টি টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে এসএসসি ৩৪টি ও এইচএসসির ১২টি ট্রেডে ২ বছর মেয়াদি ভোকেশনাল কোর্স চালু রয়েছে।

বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে পারলে তারাই হবে দেশের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিকল্প নেই। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্ম-কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বিগত বছরগুলোতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ হলেও কারিগরি শিক্ষা নিয়ে রয়েছে একটি মিশ্র মনোভাব। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন। প্রশ্ন রয়েছে যথাযথ দক্ষতা অর্জন নিয়েও। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর কতভাগ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পড়াশোনা করে তা নিয়েও রয়েছে অস্পষ্টতা। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বাস্তব প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এর বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

একজন কর্মজীবী মানুষ যখন দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, কর্মকুশলতা ও নিষ্ঠার সমন্বয়ে তার কর্মে সুনিপণ হয়ে উঠে তখন তাকে বিবেচনা করা হয় মানবসম্পদ হিসেবে। শ্রমজীবীর শ্রমকে যখন জনচাহিদা পূরণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় তখনই তার ফলাফল হয়ে উঠে মূল্যবান, সমাজে তার অবদান হয়ে উঠে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার দক্ষতা যদি অব্যবহৃত থেকে যায়, যোগ্যস্থানে তার ঠাঁই না হয় কিংবা সঠিক পরিচর্যার অভাবে তার দক্ষতা নির্জীব হয়ে পড়ে, তবে সবই বৃথা হয়ে যায়- সম্ভাবনাময় মানবসম্পদও হয়ে পড়ে বোঝা। আবহমানকাল কাল থেকেই বাংলাদেশের জনগণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে বিবেচিত হয়েছে মানব মূলধন হিসেবে। অতীতে এই মূলধনের কার্যকর ব্যবহারেই অর্জিত হয়েছে আর্থিক মুনাফা, জীবনধারণের ক্ষেত্র হয়েছে সম্প্রসারিত। তবে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনশক্তির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং এই বৃদ্ধি ২০৪০ সাল পযন্ত অব্যাহত থাকবে। এখন দেশে পনের বছরের অধিক বয়সী শ্রমশক্তি রয়েছে ৫ কোটি ৮৭ লাখ। মানব মূলধন হিসেবে অর্থনীতিতে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এদের কারিগরি দক্ষতায় অনেক ঘাটতি রয়েছে। কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ জনবলের অভাবেই দেশের শিল্প কারখারা খাতে প্রতি বছর ছয় শ’ কোটি ডলার বা প্রায় সাতচল্লিশ হাজার কোটি টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। এ সমস্যার মূলে রয়েছে কারিগরি বিষয়ের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন খাতে বিনিয়োগের স্বল্পতা। দেশের ষাট শতাংশের বেশি মানুষের বয়স পঁয়ত্রিশ

বছরের নিচে হলেও কারিগরি দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাবে এদের শিল্পখাতে নিয়োগ করা যাচ্ছে না। এই কর্মীদের প্রায় চুয়াল্লিশ শতাংশের কর্মসংস্থান হচ্ছে কৃষিতে আর প্রায় ৩৭ ভাগ সেবা খাতে। কিন্তু কৃষি আর সেবা খাতে জনসংখ্যার আধিক্য শিল্প খাতকে এগিয়ে নেয়ার পক্ষে সহায়ক নয়। এমনিতেই কারিগরি দক্ষতার ঘাটতির কারণে এ দেশের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা এ দেশের শিল্প কারখানা চাহিদা উপযোগী নয়, নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার দক্ষতাও অনেক কম। ফলে কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের স্বল্পতায় দেশে ইতিবাচক বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে শিল্পায়নের ধারাকে বেগবান করে এ খাতের সুফল কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তবে রূপকল্প ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১ কে সামনে রেখে এখন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ও কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে ডিগ্রীধারী শিক্ষার্থীদের অনেকেই কর্মজীবনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠছে না। পাশাপাশি দেশে সাধারণ শিক্ষার যতটুকু প্রসার কারিগরি শিক্ষাখাত তত বেশি গুরুত্ব পায়নি। সরকারের দিকনির্দেশনায় বর্তমানে বিদ্যমান পরিস্থিতির উন্নয়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা ও সরকার এই ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ককে জোরদার করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাঙ্গনের পাঠ্যক্রমও ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পাঠ্যক্রমে সৃজনশীলতা, কর্মমুখী ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে শিল্পখাতের উপযোগী কর্মী বাহিনী তৈরি করার যথোপযুক্ত সময় এখনই। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য অনতিবিলম্বে সরকার ও জন সংশ্লিষ্টতায় গৃহিত যৌথ উদ্যোগে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিল্প-কারখানার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী তৈরির মাধ্যমে দেশের শিল্পায়নে নব গতির সঞ্চার হবে, এটাই সকলের প্রত্যাশা। সকলকে মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়েও টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সমানতালে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ট্রেনিং কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বল্পশিক্ষিত লোকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া সরকারের যুব ও ক্রীড়া এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেও বেকার যুবক ও মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আবার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ইউসেপ নামের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল শিক্ষা দিয়ে আসছে। তবে এত সব আয়োজন সত্যিকার অর্থে একাডেমিক শিক্ষার মধ্যে পড়ে না। এতে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

দেশের চাহিদা মেটানো ও বিদেশে জনশক্তি রপ্তানিতে ব্যাপক কারিগরি শিক্ষা প্রয়োজন। সরকার এ ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগের দিকে হাঁটছে বলেই আমাদের মনে হয়। সরকার যখন ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করছে এবং এগুলোর কাজ এগিয়ে চলছে তখন এখানকার চাহিদা মেটানোর জন্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০টি কারিগরি স্কুল ও কলেজ নির্মাণের উদ্যোগ কর্মসংস্থান সুযোগে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখানে স্থানীয় সম্পদ ও স্থানীয় মানবসম্পদ ব্যবহারের এক সুযোগ তৈরি হবে।

এখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা কাছাকাছি কোনো অর্থনৈতিক অঞ্চলে কাজ করতে পারবে। তবে ভৌগোলিক বিচারে, আঞ্চলিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে কারিগরি শিক্ষার ধরনের মধ্যে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা হবে ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্র। আবার দেশের বাইরের চাহিদার প্রতিও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা আমাদের জনশক্তি বিশাল। এখানে বাইরের বাজার না ধরতে পারলে আমাদের পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। আমরা অদক্ষ শ্রমিক রপ্তানিতেই সীমাবদ্ধ থাকব। আমাদের অর্থনৈতিক শক্তির চালিকাশক্তি বর্তমান সময়ে কৃষি, গার্মেন্টস ও জনশক্তি রপ্তানি। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের কিছু পরামর্শ প্রদানে বাম্পার ফসল পাওয়া যাচ্ছে। গার্মেন্টস সেক্টরে অদক্ষ নারী শ্রমিক কাজ করছে। আর জনশক্তি রপ্তানিতে এখনো

বাংলাদেশে অদক্ষ ক্যাটাগরিতেই রয়ে গেছি। আমাদের অর্থনৈতিক শক্তির জন্য বিকল্প প্রয়োজন এ কারণে যে কৃষিতে আমাদের সাফল্য ভালো; কিন্তু প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম খাত বিদেশ থেকে আসা রেমিটেন্স। বিদেশে কর্মরত দক্ষ জনশক্তির সিংহভাগই ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি প্রকৌশলী। এদেশের ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা সুনাম ও দক্ষতার সাথে মধ্যপ্রাচ্য, জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কর্মরত। এছাড়াও যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ দেশের ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা চাকরি করে দেশের জন্য বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছেন। বিদেশে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীর মতো দক্ষ জনসম্পদ আরো বেশী পাঠানো সম্ভব হলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হারও বৃদ্ধি পেত। দেশের আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি বাড়াতে হলে কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ছাড়া বিকল্প নেই। দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশে TVET (Technical and Vocational Education and Training) এর বর্তমান অবস্থার আরও সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন দরকার। এ ছাড়াও ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের শিল্পকারখানা ও সেবামূলক কাজে যে পরিমাণ চাহিদা রয়েছে তদনুযায়ী শ্রম সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বাংলাদেশে TVET (Technical and Vocational Education and Training) শিক্ষার সম্প্রসারণ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা যে হারে দ্রুত প্রসার লাভ ঘটছে, কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে তা হয়নি। বর্তমানে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি শিক্ষার অধীনে শিক্ষা গ্রহণরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭ শতাংশ মাত্র, অথচ জাপানে এ ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত জনবল ৬০ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪০ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৪২ শতাংশ।

শিক্ষাকে গুরুত্ব দিলে দেশ এগোবেই। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়াকে উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। দেশটির অবস্থা প্রথমে বাংলাদেশ থেকে খুব বেশি উন্নত ছিল না। তখন আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল ওদের দ্বিগুণ। অথচ এখন তাদের মাথাপিছু আয় ১২-১৪ গুণ বেশি। এর একমাত্র কারণ হলো তাদের সরকার শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মানব সম্পদ হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুঁজি। শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তিকে বলা হয় মানব মূলধন। কারিগরি শিক্ষা দিয়ে জনগণকে দক্ষ করে তুললে তা হবে সবচেয়ে বড় পুঁজি। একটি দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী হতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, দেশটি সমৃদ্ধিশালী বা উন্নত হবে। বিশ্বের অনেক দেশ রয়েছে, যাদের রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু তারা বিশ্বের বুকে উন্নতশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারিনি। যেমন আফ্রিকার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো বা সুদানের কথা বলা যেতে পারে। নাইজেরিয়া পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। অ্যাঙ্গোলাও তেলসমৃদ্ধ, কিন্তু দরিদ্র। লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম দেশ। এর কারণ সেখানে শিক্ষাকে গুরুত্ব না দেয়ায় দেশগুলোতে কাঙ্খিত অগ্রগতি হয়নি। প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য দরকার বিজ্ঞানী, কারিগরি, দক্ষ জনবল ও একটি উদ্যমী সরকার। সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ের মতো দেশ দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়েছে।

অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, যেমন- জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি রাষ্ট্র গুরুত্ব দিয়েছে মানব সম্পদে। এ দেশগুলো শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। মেইজি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে জাপানের অবস্থাও বাংলাদেশের মতো ছিল। কিন্তু চাহিদা ভিত্তিক শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল দেশটি। ১৮৭৭ সালে জাপানের টোকিওতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হয়। ১৮৮০ সালে সেখান থেকে প্রথম গ্র্যাজুয়েটেরা বের হয়। এ গ্র্যাজুয়েটদের ৯০ শতাংশ ছিল ফিজিকস, কেমিস্ট্রি ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে পাস করা। কারণ সে সময় দেশটিতে ফিজিসিস্ট, কেমিস্ট, গণিতবিদদের প্রয়োজন ছিল সবেচেয়ে বেশি। তাই শুধু শিক্ষার হার বাড়ালেই হবে না। জানতে হবে কী ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন।

কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব আমাদের দেশে এতটাই বেশি, যা আমরা প্রতিমুহূর্তেই অনুভব করি। দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাটো জিনিসপত্র মেরামতের জন্য নির্ভর করতে হয় নিরক্ষর কোন মেকানিকের উপর। আবার শিক্ষার উদ্দেশ্য

যদি হয় প্রায়োগিক কিছু সৃষ্টি করা, সে ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য কারিগরি শিক্ষা অতীব প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান সরকার সে দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পটভূমিতে কারিগরি শিক্ষা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর আশানুরূপ বিকাশ ঘটেনি দেশের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোর। ফলে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি নানা কারণে অবহেলিতই রয়ে গেছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকান্ড। দক্ষ জনশক্তির অভাবে উৎপাদন ও সেবামূলক উন্নয়ন কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। তাছাড়া বিদেশে অদক্ষ শ্রমিক পাঠানোর ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না। অথচ দেশকে সমৃদ্ধ করতে হলে শ্রমপোযোগী দক্ষ জনশক্তি বিশেষ প্রয়োজন। কাজেই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞানে দক্ষতা সম্পন্ন যুবসমাজকে দেশের উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করা হলে তা দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সহায়ক হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বর্তমানে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বিপুল জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে কারিগরি শিক্ষাই হচ্ছে একমাত্র শক্তিশালী হাতিয়ার। কারণ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষদেশে এবং বিদেশে চাকরির সংস্থান করে নিতে পারে তেমনি, আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করে নিতে পারে। কারিগরি শিক্ষার ওপর দেশের উন্নতিও নির্ভর করছে। কারণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা যায় অতি সহজে ফলে আর্থিকভাবে দেশের উন্নয়নকে তরান্বিত করা যায়। তাই উৎপাদনমুখী ও জীবনভিত্তিক এ শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং এক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যেএর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করা দরকার এবং শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের উৎসাহিত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা জরুরি এবং প্রয়োজনবোধে মেধাবীদের সম্পূর্ণ সরকারি খরচে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।এ ধরনের শিক্ষায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বরাদ্দ বাড়ানো উচিত। বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থায়ন, এমপিওভুক্তির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার সাথে সাথে এদের শিক্ষার মানকে আদর্শমানে রাখার জন্য নিয়মিত পরিবীক্ষণের উপর জোর দেয়া উচিত।

দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতিতে দক্ষ, মেধাবী এবং কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তির বিকল্প নেই। যদি এভাবে দেশের সকল কর্মক্ষম মানুষকে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায় তাহলে অতিশীঘ্রই সমৃদ্ধশীল বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। কিন্তু তরুণ, যুবকসহ যারা চাকরি বাজারে প্রবেশ করছে তাদের ৮০ থেকে ৮৫ ভাগই অদক্ষ হিসেবে আসছে। সরকারের নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেশে কারিগরি শিক্ষা এখনো রয়েছে উপেক্ষিত। যে স্বল্পসংখ্যক তরুণ কারিগরি শিক্ষা নিয়ে কর্মবাজারে প্রবেশ করেছে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। এমনি অবস্থায় সরকারের সামনে কারিগরি শিক্ষার প্রসার, এ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান অপরিহার্য। যথাযথভাবে এসব কাজ করা গেলে দেশের বর্ধিত জনসংখ্যা সমস্যা না হয়ে পরিণত হবে সম্পদে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ও যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'মারসার প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় 'শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। পরিসংখ্যানে বলা হয় বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের হার ৪৭%। শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে ১২৪ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৯তম। এছাড়া এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২২ দেশের মধ্যে ১৭তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলঙ্কা ও ভুটানের পরে রয়েছে বাংলাদেশ। নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মধ্যে তাজাকিস্তান ও কম্বোডিয়ার পর বাংলাদেশের অবস্থান। ১০০ স্কোর ধরে পরিচালিত এ গবেষণায় বাংলাদেশের স্কোর ৫৭.৬২। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের ২৫ থেকে ৫৪ বছর বয়সীদের ৮২ শতাংশ কর্মে নিয়োজিত থাকলেও এর মধ্যে মাত্র ৬.৩ শতাংশ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন। বাকিদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ মাঝারি দক্ষ ও ৪০.৭ শতাংশ অদক্ষ। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে কর্মে নিয়োজিতের হার ৫৯ শতাংশ। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়, বিজনেস স্কুলের মান মাঝারি

ধরনের, স্কোর ৭-এর মধ্যে ৩.৭২। এ স্কোর গণিত বা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ৩.৩৬, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সেবায় ৩.১১, মেধা আকর্ষণ ক্ষমতায় ২.৪ ও মেধা ধরে রাখার ক্ষমতায় ২.৭১। পেশার সঙ্গে শিক্ষার অসামঞ্জস্যতার চিত্রও উঠে এসেছে এ গবেষণায়। বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বছরে ৩ লাখ ১৬ হাজার শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এর মধ্যে সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায় ও আইন বিষয়ে ১ লাখ ৩৫ হাজার, মানবিক বিভাগে ১ লাখ ১০ হাজার ও বিজ্ঞান বিভাগে ৩৫ হাজার। অথচ প্রকৌশল, উৎপাদন ও নির্মাণ বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে মাত্র ১৪ হাজার। স্বাস্থ্য সেবায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী। বাকিরা অন্যান্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। উন্নত দেশে উচ্চ শিক্ষার হার ৫-৭ ভাগ। বর্তমানে এ হার ৫-৭ ভাগ অর্জিত হয়েছে। চাকরির বাজারে মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের চাহিদা কম। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংযোগও সেভাবে নেই। দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি অনীহায় তথ্য অনুযায়ী এ হার শতকরা ১৩.৬ ভাগ। অথচ বিশ্বচ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তির হার বৃদ্ধির বিকল্প নেই। উন্নত দেশসমূহে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার হার ২৫ থেকে ৭৫ ভাগ। যে দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার হার যত বেশি সে দেশের তত উন্নত। জাপান, গণচীন, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন উন্নত দেশের নাম উল্লেখ করা যায়। দেশে মানসম্মত কারিগরি শিক্ষার বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। দেশে সরকারি ও বেসরকারি সাত হাজার ২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নানামুখী উদ্যোগে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার হার ১.৮ ভাগ থেকে বর্তমানে ১৩.৬ ভাগে উন্নীত হয়েছে। 'দক্ষ বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে প্রয়োজন অধিক হারে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

বৈশ্বিক বাস্তবতায় জীবনের সকল স্তরে দক্ষতার বিকল্প নেই। সকল উন্নয়ন যেহেতু মানবকল্যাণ কেন্দ্রিক, তাই দক্ষতার ক্ষেত্রে মানবিক দর্শন থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ দক্ষতার সুফল তখনই সার্থক হয়, যখন দেশ জাতির অগ্রগতিতে সেটি নিবেদিত থাকে। ২০২১ সালে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বর্তমান সরকার যে ভিশন-২০২১ নির্ধারণ করছে তার জন্যও কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য কয়টি–
ক. ৬টি
খ. ৪টি
গ. ৩টি
ঘ. মাত্র ২টি

২. অষ্টম শ্রেণি পাস করার পর কেউ যদি মূলধারায় পড়াশুনা না করে তাহলে তারা কতদিনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে ও কোন দক্ষতামান অর্জন করবে-
ক. তিন মাস মেয়াদী, দক্ষতামান- ৪
খ. তিন মাস মেয়াদী, দক্ষতামান-২
গ. ছয় মাস মেয়াদী, দক্ষতামান- ১
ঘ. ছয় মাস মেয়াদী, দক্ষতামান- ৩

৩. মারসার প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষিত বেকারের হার-
ক. ৪৭%
খ. ৪৯%
গ. ৫২%
ঘ. ৬০%

উত্তরমালাঃ ১। গ; ২। গ; ৩। ক।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রভাব মানব সম্পদ উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ- ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৪.৫: মানব সম্পদ উন্নয়নে নারী শিক্ষার ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নারী শিক্ষা বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- নারী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- নারী শিক্ষার উপযোগিতাগুলো বর্ণনা করতে পারবে;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন এর সাথে নারী শিক্ষার সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে পুরুষের পাশাপাশি যোগ্যতা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেন্ডার বৈষম্যহীনভাবে সাধারণ শিক্ষার মূলধারায় নারী সমাজকে শিক্ষাদান করে শিক্ষিত করে তুলে নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী, অধিকার সচেতন, কর্মজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী ও সচেতন করে তোলা।

উইকিপিডিয়ায় (Wikipedia) নারী শিক্ষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে "Female Education is a catch-all term of a complex set of issues and debetes surrounding education (primary education, secondary education,tertiary ducation and health education in particular) for girls and women. It includes areas of gender equality and access to education,its connection to the allevation of poverty".

'দেশ ও সমাজ উন্নয়নের মূল ভিত্তি শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে এ দেশের সর্বস্তরে ব্যাপক সংখ্যক নারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। নারী শিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশুযত্ন ও ঘরকন্যার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে জাতীয় উন্নয়নে নারীকে নিষ্ক্রিয় রাখার বিরাজমান প্রবণতা দূর করা হবে। সার্বিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সুষম সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে'।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী নারীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ–

- নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা এবং সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করা।
- সকল পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণে নারীকে উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ করা।
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে কাজে নিয়োজিত হয়ে এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধনে ভূমিকা পালন করা।
- যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরসন এবং নারীর অধঃস্তন অবস্থার পরিবর্তন ও তাঁর সমঅধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় নারী যাতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন তার উপযোগী করে নারীকে গড়ে তোলা।

এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ যে কৌশল এর কথা উল্লেখ আছে সেগুলো নিম্নরূপ: এই কৌশলগুলোকে নারীদের শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার কৌশলও বলা যেতে পারে।

কৌশল:

১. বাজেটে নারীশিক্ষা খাতে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হবে। শিক্ষার সকল স্তরে নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা এবং বেসরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়নকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা করা।

২. ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ঝরে পড়া ছাত্রীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যাদেরকে এভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না তাদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওতায় আনা।

৩. ছাত্রীদের জন্য খণ্ডকালীন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি নজর দেওয়া।

৪. অধিক সংখ্যক মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে এবং তাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা/পেশাদারি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো এবং এ বিষয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরা হবে যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা।

৭. মাধ্যমিক স্তরের শেষের দু'বছরের পাঠ্যক্রমে "জেন্ডার স্টাডিজ" এবং প্রজনন-স্বাস্থ্য (Reproductive health) অন্তর্ভুক্ত করা ।

৮. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিষয় নির্বাচনে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের পুরো স্বাধীনতা থাকবে এবং সকল বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। কোনো বিশেষ বিষয়ের দিকে (যেমন- গার্হস্থ্য অর্থনীতি) মেয়েদের উৎসাহিত করা বা ঠেলে না দেওয়া।

৯. ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সময় যাতে অসুবিধার সম্মুখিন না হয় সেজন্য তাদের শিক্ষার সুবিধার্থে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধা ও প্রয়োজনে নিরাপদ ছাত্রী নিবাসের ব্যবস্থা করা।

১০. মেয়েদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষায় এবং পেশাদারি শিক্ষায় (যেমন- প্রকৌশল, মেডিকেল, আইন, ব্যবসায় ইত্যাদি) উৎসাহিত করা।

১১. দেশে মেয়েদের জন্য চারটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে। মেয়েরা যাতে অধিক হারে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনে মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আরও বাড়ানো হবে। প্রস্তাবিত উপজেলা কারিগরি বিদ্যালয়সমূহ মেয়েদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে।

১২. উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং সুদমুক্ত/স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৩. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রণীত যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত বিধিবিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।

কায়েরো থেকে বেইজিং পর্যন্ত সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রায়নের জন্য মেয়েদের গুণগত বা মানসম্পন্ন ও সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। USAID এর ক্যারলা কোপেল (Carla Koppel) নারী শিক্ষাকে ক্ষমতায়ন ও

অগ্রায়নের ক্ষেত্রে ‘রূপালী বুলেট (Silver bullet)’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সব অঞ্চলের নারী শিক্ষা টেকসইয়তা (Sustainability) ও এর অগ্রগতি (Progress) নির্ভর করে বিশ্বের সকল নারীর সফলতার উপর। লরেন স্টেপ (Lauren Stepp) দশটি কারণে নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্ধারণ করেছেন সেগুলো নিচে দেয়া হলো-

দশটি কারণে নারী শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ:

১. **সাক্ষরতার হার বাড়ায়:** বিশ্বে ১৬৩ মিলিয়ন যুব অসাক্ষরদের মধ্যে ৬৩% হলো নারী। সকল শিশুর জন্য শিক্ষা কার্যক্রম তরান্বিত করতে পারলে শিক্ষার হার বেড়ে যাবে। যা পিছিয়ে থাকা এলাকার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

২. **মানব পাচার:** ইউনাইটেড নেশনের ইন্টার এজেন্সি প্রজেক্ট এর আওতায় হিউম্যান ট্রাফিকিং প্রজেক্ট এর মতে বেশির ভাগ নারী পাচারের ঝুঁকির অন্যতম কারণ শিক্ষার অভাব ও দরিদ্রতা। কিশোর, যুব ও নিরক্ষর নারীদের মৌলিক দক্ষতা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্প কারখানায় নিয়োজিত করলে ব্যক্তিক ও শিল্প-কারখানার আয় অনেক বাড়বে।

৩. **রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব:** সারাবিশ্বে নারীরা ভোটার হিসেবে অবহেলিত ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় নিষেধাজ্ঞার আওতায়। জাতিসংঘের নারী নের্তৃত্ব ও অংশগ্রহণ কার্যক্রম এর মতে নারীদের সাধারণ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বিরাজমান রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও ক্ষমতায়নের বৈষম্য কমাতে পারে।

৪. **শিশুর আয়ুষ্কাল বাড়ে :** জাতিসংঘে (মেয়ে শিক্ষা উদ্যোগ শাখা) এর মতে শিক্ষিত মা’দের ক্ষেত্রে শিশুদের পাঁচ বছর টিকে থাকার জীবনকাল অশিক্ষিত মায়েদের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে থাকে।

৫. **নিরাপদ যৌনজীবন:** প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন মেয়েরা এইচআইভি সংস্পর্শে অশিক্ষিত মেয়েদের তুলনায় তিনগুণ কম আসে। বিশ্ব ব্যাংক এ জন্য শিক্ষাকে এইডস প্রতিরক্ষায় ‘‘আশার বাতায়ন” (Window of hope) বলে আখ্যায়িত করেছে।

৬. **বাল্যকালোত্তর বিবাহ:** ইউনাইটেড নেশন পপুলেশন ফান্ড এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অনুন্নত দেশসমূহে প্রতি তিনজন মেয়ের মধ্যে একজনের ১৮ বছর পূর্ণ হবার আগে বিয়ে হয়ে যায়। যে সব অঞ্চলে মেয়েরা ৭ থেকে ৮ বছর মেয়াদি শিক্ষা গ্রহণ করেছে সেখানে বিয়ের বয়স কমপক্ষে চার বছর পিছিয়েছে।

৭. **ছোট পরিবার:** মেয়েদের স্কুল শিক্ষা বাড়ার সাথে সাথে সন্তান নেবার হার কমছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে মালিতে যেসব মেয়েরা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছে তাদের সন্তান সংখ্যা গড়ে তিনজন অপরদিকে যারা শিক্ষত নন তাদের সন্তান সংখ্যা গড়ে ৭ জন।

৮. **আর্থিক ক্ষমতা:** শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের অর্থ উপার্জনের সামর্থ্য বৃদ্ধি হয় ফলে নারী ক্ষমতায়ন লাভ করে। ইউনেসকো মতে, মাত্র এক বছর প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষা শেষে নারীদের আয় প্রায় ২০% বৃদ্ধি পায় ।

৯. **জিডিপি উন্নয়ন:** ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই যখন শিক্ষার জন্য সমান সুযোগ দেয়া হয় তখন জিডিপি বৃদ্ধি পায়। স্কুলে মেয়েদের সংখ্যা ১০% বুদ্ধি পেলে তখন ৩% হারে জিডিপি বাড়ে।

১০. **দরিদ্রতা বিমোচন:** মেয়েদেরকে যখন তাদের সমান অধিকার ও স্কুলে যাবার সমান সুযোগ করে দেয়া হয় তখন তারা ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধির ফলে তারা দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করে পুরো পরিবারকে খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান করতে পারে।

নারী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা, সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করা, সকল পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণে নারীকে উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ করা, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করা, সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ্যময় পরিবার গঠনে উৎসাহিত করা এবং যৌতূক ও নারী নির্যাতন রোধ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে পারে, নারীর মধ্যে এমন দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করা।

নারী শিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশু যত্নের ও ঘরকন্যার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক জাতীয় উন্নয়নে নিষ্ক্রিয় রাখার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রবণতা দূর করতে হবে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অসামান্য অবদান রেখেছে। স্বাধীনতার পর থেকে নারী আত্মনির্ভরশীল, জাতীয় উৎপাদনে অংশগ্রহণ, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হয়ে ওঠে। তাই নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই আলোকে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। বহুল আলোচিত এ প্রত্যয়টিকে এখন সামাজিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেবলমাত্র মানবেতর অবস্থা থেকে নারীর মুক্তি বা নারী উন্নয়নের জন্যই নয়, পৃথিবী মুখোমুখি এমন সকল সমস্যার সমাধানে প্রধান ও প্রথম ধাপ হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। কেবল আন্তর্জাতিক পরিসরে নয়, বাংলাদেশেও স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পরিসরে যে কোনো নীতি নির্ধারণী আলোচনায় বা সমস্যা সমাধানে নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পিতৃতন্ত্রের সপক্ষে রচিত আইন কানুন, ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি, অনাধুনিক উন্নয়ন কৌশলের অনুসরণ, পরিবেশ বিপর্যয় ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়েছে। নারী বান্ধব আইনগুলো বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হচ্ছে তবে তা খুবই ধীর গতিতে।

বর্তমান সরকারের দূরদর্শী পদক্ষেপ কুসংস্কারমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় নারীদের সাহস জোগাচ্ছে। কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে নারীকে অধিকার বঞ্চিত করার সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার কারণে সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে নারীর পদচারণার হার বাড়ছে। সব পেশাতেই এখন নারীরা কাজ করছে। নারী পুলিশ সদস্যরা জাতিসংঘ শান্তি মিশনে কাজ করছে। সশস্ত্র বাহিনীতে নারীর সাহসী উপস্থিতি সবার দৃষ্টি কাড়ছে। বাঙালি নারীরা শিল্প প্রতিষ্ঠায়ও ভালো করছে। সরকার নারী উদ্যোক্তাদের বিনা জামানতে ও স্বল্প সুদে ঋণ দিচ্ছে। সরকার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে যুব নারী-পুরুষকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের ঋণ দিচ্ছে। আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে। বছরে বিপুল সংখ্যক নারী চাকরি নিয়ে বিদেশে যাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সরকারের চুক্তির ফলে নারীকর্মীদের বিদেশে যাওয়ার পথ আরো প্রশস্ত হয়েছে। এখন প্রতিটি নারীকর্মীকে তার কর্মের জন্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গন্তব্য দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, শিষ্টাচার, আইনকানুন, প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে দুই মাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সরকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বেতন, ছুটি, বীমাসহ চাকরিজীবী হিসেবে সব সুযোগ-সুবিধা আগেই চূড়ান্ত করে। গত চার বছরে ১ লাখ ২০ হাজার নারীকর্মী সুনির্দিষ্ট চাকরি নিয়ে বিদেশে গেছে এবং এ বছর (২০১৭ সাল) ৪০ হাজার নারীকর্মী সৌদি আরবে প্রেরণ করার প্রক্রিয়া চলছে। এতে গ্রামীণ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হচ্ছে। যার প্রভাব সমাজ ও রাজনীতিতে পড়ছে। সন্তানদের উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীভূত হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এ অগ্রযাত্রাকে টেকসই করতে সরকারি নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। এজন্য জনগণকে আরো তৎপর হতে হবে। সমাজকে অন্ধত্ব থেকে আলোর পথে আনতে সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন।

নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সমাজের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। শিক্ষা পরিবারের কার্যক্ষম ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। নারী শিক্ষিত হলে পরিবারে প্রজনন হার হ্রাস পায়। সে কারণে নারী উৎপাদনশীল কাজে বেশি সময় ব্যয় করতে পারে। দেশের মোট উৎপাদন বাড়ে। আবার বিজ্ঞানসম্মত ও গুণগত মানের শিক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। শিক্ষা ও উন্নয়নের সম্পর্ক তাই খুবই গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। নারী শিক্ষা নারীর উন্নয়নের অর্থনৈতিক হাতিয়ার। বাংলাদেশে নারী শিক্ষা পূর্বের তুলনায় ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। নারী আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালো ফলাফল অর্জন করছে এবং চাকুরীক্ষেত্রে নারী চাকুরীজীবির হার পূর্বের তূলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই নারী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নারী শিক্ষা বলতে বোঝায়-
ক. নারীকে তার সাংসারিক কাজ কর্মে দক্ষতা অর্জন করানো
খ. নারীকে শিশু পালনে দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার কমানো
গ. নারীদের বাইরের কর্মজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা
ঘ. জেন্ডার বৈষম্যহীনভাবে সাধারণ শিক্ষার মূলধারায় নারীদের (মেয়েদের) শিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

২. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী নীচের কোনটি নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য–
ক. যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরসন এবং নারীর অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন ও তাঁর সমঅধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় নারী যাতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন তার উপযোগী করে নারীকে গড়ে তোলা
খ. নারীদের উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করা
গ. নারীদের সেবামূলক কাজে সহযোগী হিসাবে যোগ্য করে গড়ে তোলা
ঘ. নারীদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার করানো ও নারীবাদী সমাজ গড়ে তোলায় উদ্যোগী করা

৩. বাংলাদেশে মহিলা পলিটেকনিকের সংখ্যা-
ক. ১টি
খ. ২ টি
গ. ৪ টি
ঘ. ৬ টি

উত্তরমালা: ১। ঘ, ২। ক, ৩। গ।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানব সম্পদ উন্নয়নে নারী শিক্ষা কী ভুমিকা রাখছে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ ৪.৬: মানব সম্পদ উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষার ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উচ্চ শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- উচ্চ শিক্ষার প্রান্তিক অর্জন সম্পর্কে বরতে পারবেন;
- মানব সম্পদ উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলোর জন্য স্বশাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য। তবে তা যথানিয়মে নির্ধারিত নীতিমালার আওতায় বাস্তবায়িত হবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ প্রস্তাবিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সরকারি তদারকির ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান সাধনায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ আপন বিষয়ে গভীরতা অর্জনের প্রয়োজনে তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করছেন, ফলে জ্ঞানের জগতে বিভাজন ঘটছে। অন্যদিকে একটি বিপরীত প্রক্রিয়াও চলছে অর্থাৎ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয় পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিশ্বজগত সম্পর্কে অভিনব উপলব্ধি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জ্ঞানের জগতে সকল বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি অতিক্রম করে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সমর্থ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস আবশ্যক। মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং ক্ষেত্রবিশেষে (যথা- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায়) বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে পারে সেই আলোকে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নিয়মানুসারে চালিত হতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কৌশল নিচে দেয়া হলো-

উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

- কার্যকরভাবে বিশ্বমানের শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগানো এবং মানবিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা দান।
- অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তা দান করা।
- পাঠদান পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দেশের বাস্তবতাকে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা শনাক্ত করা ও সমাধান বের করা।
- নিরলস জ্ঞানচর্চা ও নিত্যনতুন বহুমুখী মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রমসম্প্রসারণ।

- আধুনিক ও দ্রুত অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে কার্যকর পরিচিতি ঘটানো।
- জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি।
- জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী হতে জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি।
- মেধার বিকাশ এবং সৃজনশীল নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতির উদ্ভাবন।
- জ্ঞান সৃজনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টি।

কৌশল: (উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের কৌশল)

১. বিভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করা।

২. মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং আদিবাসীসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, বিভিনড়ব কারণে অনগ্রসর এবং অন্যান্য গোষ্ঠির সন্তানদেরকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আবাসিক সুবিধা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ ও বৃত্তিপ্রদানসহ বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে।

৩. শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে পারে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (যেমন- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে) উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হবে। কোটা পদ্ধতি বা অন্য কারণে ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা হবে না।

৪. উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বপ্রকার যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫. চার বছরের সম্মান স্নাতক ডিগ্রিকে সমাপনী ডিগ্রি হিসেবে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য সকল কর্মক্ষেত্রে যোগদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৬. যে সকল কলেজে তিন বছর মেয়দি স্নাতক ডিগ্রি কোর্স চালু আছে পর্যায়ক্রমে সেখানে চার বছরের সর্বাত্মক সম্মান ডিগ্রি কোর্স চালু করা হবে।

৭. মাস্টার্স, এম.ফিল বা পিএইচ.ডি-কে বিশেষায়িত শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং শুধুমাত্র গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। গবেষণা নিশ্চিত করার জন্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগে পর্যায়ক্রমে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালু করে সেখানে নিয়মিতভাবে মাস্টার্স, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণত মাস্টার্স এক বছরের, এম.ফিল দু বছরের এবং পিএইচ.ডি রেজিস্ট্রেশনের সময় হতে ছয় বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৮. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে সকল কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণি চালু আছে, সে সকল কলেজে এ শ্রেণী অব্যাহত থাকবে। তবে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য তাদের গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিক্ষকদের মান উন্নয়নে ব্যাপক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল কলেজে চার বছরের ডিগ্রি অনার্স কোর্স চালু করা হবে, প্রয়োজনে সেগুলোতেও এই বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে।

৯. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সকল ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের (৩ ক্রেডিট) ইংরেজি বিষয় সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

১০. গবেষণার কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একযোগে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের গবেষণার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক আকর্ষণীয় মূল্যের গবেষণা অনুদান এবং সম্প্রতি প্রবর্তিত বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ছাড়াও আরো ফেলোশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডিগ্রি কলেজগুলোতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১১. উচ্চ শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের। উচ্চ শিক্ষা বাংলায় সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা

বাংলা ভাষায় অনুদিত হওয়া প্রয়োজন। এই কাজকে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উচ্চশিক্ষায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ব্যবহার অব্যাহত থাকবে।

১২. উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, শান্তি ও সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থাও থাকবে।

১৩. উচ্চ শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হবে। সরকারি অনুদান ছাড়াও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীর বেতন ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যক্তিগত অনুদান সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য। অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর বেতন নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে। এতে অসচ্ছল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। অসচ্ছলতা প্রমাণের মূল দায়িত্ব অভিভাবকের উপর ন্যস্ত থাকবে তবে তার জন্য যথাযথ নিয়মনীতি প্রণয়ন করা হবে।

১৪. শিক্ষার্থীর মেধা ও অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার নিরিখে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করা হবে। তাছাড়া মেধাবী শিক্ষার্থীরা মেধার ভিত্তিতে সহজ শর্তে যেন ব্যাংক ঋণ পেতে পারে সে ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে পাট, বস্ত্র ও চামড়া খাতের বিপুল গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট, টেক্সটাইল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ অব লেদার টেক্নোলজিকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৬. শিক্ষকদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। এলক্ষ্যে ছুটির সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের সমন্বয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ-সেমিনারের ব্যবস্থা করা হবে।

১৭. প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ নির্ধারিত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার (Academic Calendar) অনুসরণ করবে। নতুন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান কোন তারিখে শুরু হবে, কোন পরীক্ষা কখন হবে সারা বছরের কর্মসূচি সংবলিত এই অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার শিক্ষাবছর শুরু হওয়ার আগে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা হবে।

১৮. দেশের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত উপযুক্ত মানের হতে হবে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে বৈষম্যহীন হতে হবে এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করা যাবে না। এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালি সংস্কৃতির পরিপন্থি হতে পারবে না এবং এরূপ কোন কার্যক্রম চালাতে পারবে না।

১৯. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় উৎসাহিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কনসালটেন্সির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যে সকল শিক্ষক এ ধরনের প্রকল্পে কাজ করবেন তাদের যথোপযুক্ত সম্মানী প্রদান করা হবে। এরকম গবেষণা কার্যক্রম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু আছে। এই কার্যক্রম মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে পরিমার্জন করে একটি দিকনির্দেশনা-কাঠামো তৈরি করা হবে।

২০. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টেলিভিশনে সুবিধাজনক কোনো চ্যানেলে–যেমন বিটিভিতে দ্বিতীয় চ্যানেলে–অধিকতর সময় বরাদ্দ, রেডিও ট্রান্সমিশন এবং মাল্টি ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এমন ব্যক্তির চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির আয় ৫২.৬% বেশি। মাধ্যমিক শিক্ষায় যারা শিক্ষিত নন এমন ব্যক্তিদের তুলনায় এই পর্যায়ে শিক্ষিতরা ৭.২% বেশি আয় করে থাকেন আর উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষিতরা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষিতদের চেয়ে আয়ের দিক

থেকে ১৬.২% এগিয়ে। এ থেকেই বোঝা যায় কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শিক্ষার ভূমিকা। পরিতাপের বিষয় হলো যে, বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের তেমন প্রচেষ্টা দেখা যায় না বললেই চলে। দেশে দিনের পর দিন বেকারত্ব বেড়েই চলছে অথচ এই বেকারত্ব নিরসনে কর্মক্ষেত্রে কী ধরণের দক্ষতা ও শিক্ষা দরকার তার কোন পরিসংখ্যান নেই।

দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। উন্নত দেশের এটাই মূল চালিকাশক্তি। ব্যক্তিগত জীবনেও উন্নতির জন্য স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন একান্ত প্রয়োজন। তবে দক্ষতা রাতারাতি অর্জন করা সম্ভব নহে। মূলত, উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। বর্তমান সরকারের ভিষণ মোতাবেক বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ধনী দেশ হিসাবে আবির্ভূত হবে। উন্নয়নের এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে জনশক্তিকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করবার কৌশল গ্রহণ করার এখনই সময়।

দক্ষ জনশক্তি থাকলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সহজেই আকৃষ্ট হন। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য আগে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষা হতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর। কিন্তু বর্তমানে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার হতদশার কথা ভেবে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সহজ সরল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই প্রকাশের উদ্যোগ ও আয়োজন করতে হবে। বর্তমানে গণিতের ন্যায় বিজ্ঞানভীতিও আমাদের শিক্ষার্থীদের পেয়ে বসেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত জেএসসি ও পিএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট থেকে দেখা গেছে, বিজ্ঞানে দুর্বলতার কারণে অনেকে প্রত্যাশিত ফলাফল লাভ করতে পারে নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের এক জরিপে মাউশি দেখিয়েছে যে, বিজ্ঞান বিষয়ে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। শিক্ষার্থীদের এখন প্রধান আগ্রহ কমার্স বা বাণিজ্য বিষয়ে। বাংলাদেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিকাশের চাইতে ট্রেডিং বাড়ছে। এটাই হয়তো তার প্রধান কারণ। তাছাড়া, ভাল ও পর্যাপ্ত শিক্ষক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাবের অভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায়ও চলছে নানা সংকট। যুগোপযোগী সিলেবাস ও শিক্ষকের অভাব এবং অবকাঠামোগত সমস্যায় জর্জরিত শিক্ষা পদ্ধতি। অথচ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন করতে না পারলে সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না।

দক্ষ মানব সম্পদ পেতে হলে চাহিদা মাফিক বিভিন্ন বিষয়ে মানসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে হবে। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় ইন্টারনি ও মাঠ পর্যায়ে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরিকে প্রাধান্য দিতে হবে। কোন কোন বিষয়ে কত সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট দরকার তাহা পরিকল্পনা করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সেই অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে হবে। তবে কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই মানুষের দক্ষতা অধিক অর্জিত হয়। এইজন্য মানসম্মত শিক্ষার পাশাপাশি কর্মপরিবেশও উন্নত ও আধুনিক করতে হবে। মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৭০% দক্ষতা আসে কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ২০% মিথস্ক্রিয়া (ইন্টারঅ্যাকশন) ও ১০% আসে প্রশিক্ষণ হতে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল সাপোর্ট জোরদার করা প্রয়োজন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বয়স, শিক্ষা, জেন্ডার, সামাজিক শ্রেণী ইত্যাদি বিবেচনায় দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত বিনিয়োগকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। কেননা ভবিষ্যতে এটাই প্রতিষ্ঠানের অধিক উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। সর্বোপরি, জনশক্তিকে কমোডিটি বা পণ্য হিসেবে গণ্য করার কোন কারণ নেই। তাদেরকে সৃষ্টিশীল ও সামাজিক জীব (ক্রিয়েটিভ ও সোশ্যাল বিয়িং) হিসেবে দেখাই বাঞ্ছনীয়। ফ্রান্স ও জার্মানির এই অ্যাপ্রোচ বা মনোভাবের কারণে দক্ষ মানব সৃষ্টিতে তারা সফল। পরে ২০০১ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সেই দৃষ্টিভঙ্গির স্বীকৃতি দেয়। উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা হল, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে চাহিদা থাকায় তাদের দক্ষ মানব সম্পদ ও মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা উন্নয়নশীল দেশের তকমা ও এর চক্র হতে বের হয়ে আসতে পারছে না। যেহেতু এইভাবে উন্নত দেশগুলো আরও উপকৃত হচ্ছে, তাই সেইসব দেশের উচিত তৃতীয় বিশ্বের এইসব দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা। বিভিন্ন কর্মমুখী ইনস্টিটিউট ও

যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার মাধ্যমে বাংলাদেশের ন্যায় এইসব জনবহুল দেশে নূতন নূতন দক্ষ জনশক্তি তৈরি হলে তা উন্নত ও অনুন্নত উভয় দেশেরই কল্যাণ হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উচ্চ শিক্ষার কাজ হবে-
ক. জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন ও সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা
খ. বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণে উৎসাহিত করা
গ. উচ্চ শিক্ষিতের হার বাড়ানো
ঘ. দক্ষ রাজনীতিবিদ এর ঘাটতি পূরণ করা

২. উচ্চ শিক্ষার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে–
ক. জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি
খ. ডাক্তার ও প্রকৌশলী হবার পথ উন্মুক্ত করা
গ. বিদেশে চাকুরি নেবার সুযোগ তৈরি করা
ঘ. মানব সম্পদ তৈরিতে উদ্ভাবনীমূলক কাজে নিয়োজিত করার মানসিকতা অর্জন করানো

উত্তরমালাঃ ১। ক; ২। ক।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উচ্চ শিক্ষা কেবলমাত্র মেধাবী শিক্ষার্থী যারা গবেষণামূলক এবং উদ্ভাবনমূলক কাজে আগ্রহী, যারা জাতীয় উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে তাদের জন্যই কী কেবল উন্মুক্ত থাকা উচিত?- উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

তথ্যসূত্রঃ

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127583e.pdf